ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৩য় পত্র: উসূলুল ফিকহ ও আসরারুশ শরীয়াহ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

গ্রন্থকার পরিচিতি (ইমাম আল-বাজদাবী)

১. ইমাম আল-বাজদাবীর পুরো নাম কী? (ما هو الاسم الكامل للإمام البزدوي؟)
২. ইমাম আল-বাজদাবী কখন জন্মগ্রহণ করেন? (متى ولد الإمام البزدوي؟)
৩. তাঁর ইলমী প্রতিপালন বা শিক্ষা কোথায় হয়েছিল? (أين كانت نشأته العلمية؟)
৪. তিনি কোন ফিকহী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? (ما هو المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه؟)
৫. ইমাম আল-বাজদাবীর বিখ্যাত শায়খ (উস্তাদ) কে? (من هو أشهر شيوخ الإمام البزدوي؟)
৬. তাঁর বিখ্যাত ছাত্রবৃন্দ কারা? (من هم أشهر تلاميذه؟)
৭. তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ইলমী উপাধি কী? (ما هو أشهر لقب علمي له؟)
৮. তাঁর ইলমী সফরের গুরুত্ব কী ছিল? (ما هي أهمية رحلاته العلمية؟)
৯. উসূল ব্যতীত তাঁর অন্যান্য প্রধান গ্রন্থাবলি কী কী? (ما هي أبرز مؤلفاته غير الأصول؟)
১০. তাঁর সময়ে তাঁর ইলমী মর্যাদা কেমন ছিল? (ما هي مكانته العلمية في عصره؟)
১১. তাঁর প্রশংসায় একজন আলেমের বক্তব্য উল্লেখ কর। (اذكر قول أحد العلماء في مدحه)
১২. তাঁর প্রধান বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র কী ছিল? (ما هو مجال تخصصه الرئيسي؟)
১৩. ইমাম আল-বাজদাবী কখন ইন্তেকাল করেন? (متى توفي الإمام البزدوي؟)

১৪. ফিকহে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান কী? (ما هو أهم منقبة له في الفقه؟)
১৫. তাঁর ইলমী প্রতিপালনের ধরন কেমন ছিল? (ما هي طبيعة نشأته العلمية؟)

উসূলুল বাজদাবী : আল ইজমা

১৬. আভিধানিকভাবে ইজমা কী? (ما هو الإجماع لغة؟)
১৭. শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ইজমা কী? (ما هو الإجماع شرعا؟)
১৮. ইজমায়ে যরূরী (অপরিহার্য ঐকমত্য) অস্বীকারকারীর বিধান কী? (ما هو حكم منكر الإجماع الضروري؟)
১৯. ইজমা সুকূতি (নীরব ঐকমত্য) কী? (ما هو الإجماع السكوتي؟)
২০. ইজমার ভিত্তি বা "মুসতানাদ" কী? (ما هو مستند الإجماع؟)

উসূলুল বাজদাবী : আল কিয়াস

২১. শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কিয়াস কী? (ما هو القياس شرعا؟)
২২. কিয়াসের রুকন বা মৌলিক অংশগুলো কী কী? (ما هي أركان القياس؟)
২৩. কিয়াসের ক্ষেত্রে "ইল্লত" বা কারণ কী? (ما هي العلة في القياس؟)
২৪. কিয়াসের ক্ষেত্রে "আসল" (মূল) এবং "ফার'য়ু" (শাখা)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الأصل والفرع في القياس؟)
২৫. কিয়াসুল জালি (প্রকাশ্য কিয়াস) কী? (ما هو القياس الجلي؟)

উসূলুল বাজদাবী : আল ইস্তিহসান

২৬. ইস্তিহসান (পছন্দ) কী? (ما هو الاستحسان؟)
২৭. হানাফীদের নিকট ইস্তিহসান অনুযায়ী আমল করার বিধান কী? (ما حكم العمل بالاستحسان عند الحنفية؟)
২৮. ইস্তিহসান বিল-কিয়াস ও ইস্তিহসান বিল-নস-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الاستحسان بالقياس والاستحسان بالنص؟)

২৯. ইস্তিহসান সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর (র) অভিমত কী? (ما هو رأي الشافعي في الاستحسان؟)
৩০. ইস্তিহসানের বৈধতার দলীল কী? (ما هو دليل مشروعية الاستحسان؟)

উসূলুল বাজদাবী : আল ইজতিহাদ

৩১. ইজতিহাদ কী? (ما هو الاجتهاد؟)
৩২. মুজতাহিদ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত আবশ্যক? (ما هي شروط المجتهد؟)
৩৩. যন্নি (ধারণামূলক) মাসয়ালাগুলোর ক্ষেত্রে ইজতিহাদের বিধান কী? (ما حكم الاجتهاد في المسائل الظنية؟)
৩৪. ইজতিহাদ মুতলাক (নিরঙ্কুশ ইজতিহাদ) কী? (ما هو الاجتهاد المطلق؟)
৩৫. মুজতাহিদ এবং মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين المجتهد والمقلد؟)
৩৬. ইজতিহাদের প্রকারভেদগুলো কী কী? (ما هي أقسام الاجتهاد؟)
৩৭. মুজতাহিদের পক্ষে কি ভুল হওয়া সম্ভব? (هل يجوز للمجتهد أن يخطئ؟)
৩৮. “ইলা নিহায়াতিল কিতাব” (কিতাবের শেষ পর্যন্ত) অর্থ কী? (ما هو معنى "إلى نهاية الكتاب"؟)
৩৯. হানাফীদের নিকট মুজতাহিদগণের স্তর (তবকা) কী? (ما هي طبقة المجتهدين عند الحنفية؟)
৪০. কখন ইজতিহাদ ওয়াজিব হয়? (متى يكون الاجتهاد واجبا؟)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: গ্রন্থকার পরিচিতি (ইমাম আল-বাজদাবী)

১. ইমাম আল-বাজদাবীর পুরো নাম কী? (ما هو الاسم الكامل للإمام البزدوي؟)

উত্তর:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল এবং হানাফি মাযহাবের স্তম্ভস্বরূপ ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.)। তাঁর পূর্ণ নাম ও বংশপরম্পরা জানা ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

নাম ও বংশপরিচয়:

তাঁর মূল নাম হলো 'আলী' (علي)। পিতার নাম 'মুহাম্মদ' (محمد) এবং দাদার নাম 'হুসাইন' (حسين)। তাঁর উপনাম বা কুনিয়াত হলো 'আবুল হাসান' (أبو الحسن)। তবে ইলমী অঙ্গনে তিনি তাঁর লকব বা উপাধি 'ফখরুল ইসলাম' (فخر الإسلام - ইসলামের গর্ব) নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

তাঁর পূর্ণ বংশলতিকা হলো:

"عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْبَزْدَوِيُّ"

(আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে আব্দুল কারীম ইবনে মূসা ইবনে ঈসা আল-বাজদাবী)।

নিসবাত বা সম্বন্ধ:

তাঁর নামের শেষে যুক্ত 'আল-বাজদাবী' (البزدوي) শব্দটি তাঁর জন্মস্থান বা নিবাসের দিকে ইঙ্গিত করে। 'বাজদাব' (بزدة) হলো ইতিহাসখ্যাত 'নাসাফ' (বর্তমান উজবেকিস্তান)-এর একটি দুর্গ বা কেল্লার নাম। তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে বাজদাবী বলা হয়।

ইলমী ঐতিহ্য:

তিনি এমন এক সম্ভ্রান্ত ইলমী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যার প্রতিটি সদস্যই ছিলেন আলেম। তাঁর প্রপিতামহ আব্দুল কারীম (রহ.) ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের ছাত্র। এই মহান বংশের সন্তান হিসেবে তিনি ইলমে

ফিকহ ও উসূলে ফিকহের উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং "সাহিবুল উসূল" (উসূল শাস্ত্রের অধিপতি) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

---

২. ইমাম আল-বাজদাবী কখন জন্মগ্রহণ করেন? (متى ولد الإمام البزدوي؟)

উত্তর:

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী ছিল ফিকহ ও হাদিস চর্চার স্বর্ণযুগ। এই মহিমান্বিত যুগে ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সামান্য মতভেদ থাকলেও নির্ভরযোগ্য মতটি নিচে আলোচনা করা হলো।

জন্ম সন ও তারিখ:

অধিকাংশ জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের মতে, ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ৪০০ হিজরী (৪০০ হিজরী সাল) বা তার কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর জন্ম সন ৪১০ হিজরী বলা হয়েছে। ইংরেজি সাল অনুযায়ী তা ছিল আনুমানিক ১০১০ খ্রিস্টাব্দ।

জন্মস্থান:

তিনি ট্রান্সঅক্সিয়ানা বা 'মা ওয়ানারান নাহার' অঞ্চলের 'নাসাফ' (نسف) নগরীর অদূরে অবস্থিত 'বাজদাব' (بزدة) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এটি তৎকালীন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র বুখারার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল।

জন্মকালীন পরিবেশ:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন আব্বাসীয় খিলাফতের ছায়াতলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হচ্ছিল। বিশেষ করে মধ্য এশিয়ায় হানাফি ফিকহের ব্যাপক চর্চা ছিল। তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন নিজেই একজন বড় মাপের ফকীহ ছিলেন। জন্মের পর থেকেই তিনি পারিবারিক পরিমণ্ডলে ইলমী আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠেন।

আরবিতে বলা হয়:

"وُلِدَ فِي بَيْتِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ فِي حُدُودِ سَنَةِ أربعمائة مِنَ الْهِجْرَةِ"

(তিনি ইলম ও ফযিলতের ঘরে ৪০০ হিজরীর সীমানায় জন্মগ্রহণ করেন।)

তাঁর এই জন্মকাল তাঁকে হানাফি মাযহাবের 'মুতাকাদ্দিমীন' (পূর্ববর্তী) ও 'মুতাআখখিরীন' (পরবর্তী) ফকীহদের সেতুবন্ধন হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

---

৩. তাঁর ইলমী প্রতিপালন বা শিক্ষা কোথায় হয়েছিল? (أين كانت نشأته العلمية؟)

উত্তর:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর ইলমী প্রতিপালন ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি এবং উচ্চতর গবেষণা সবই তৎকালীন ইলমের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রগুলোতে সম্পন্ন হয়েছিল।

পারিবারিক শিক্ষা:

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল তাঁর নিজের ঘর। তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ। তিনি পিতার নিকট থেকেই কুরআন, আরবি ভাষা ও প্রাথমিক ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ভাই সদরুল ইসলাম আবুল ইউসর আল-বাজদাবী (রহ.)-ও ছিলেন একজন বিখ্যাত ফকীহ। দুই ভাই একই সাথে ইলমী পরিবেশে বেড়ে ওঠেন।

উচ্চশিক্ষা ও ইলমী সফর:

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি তৎকালীন ইলমের রাজধানী 'বুখারা' (بخارى) এবং 'সমরকন্দ'-এ গমন করেন। সেখানে তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ উস্তাদদের সান্নিধ্য লাভ করেন। বিশেষ করে 'শামসুল আইম্মাহ' আল-হালওয়ানী (রহ.)-এর দরসে তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন।

ইলমী পরিবেশ:

বাজদাব ও নাসাফ অঞ্চলটি ছিল ফিকহে হানাফির দুর্গ। সেখানে তিনি ফিকহ, উসূল, হাদিস, তাফসির এবং কালাম শাস্ত্রে (ধর্মতত্ত্ব) গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন

করেন। তিনি কেবল কিতাবী বিদ্যা অর্জন করেননি, বরং তৎকালীন ফকীহদের সাথে বিতর্ক (মুনাযারা) ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজের মেধা শানিত করেন।

এক কথায়, তাঁর ইলমী প্রতিপালন বা **'নাশআত'** (النَّشْأَةُ) ছিল মধ্য এশিয়ার সেই উর্বর ভূমিতে, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীর মতো মনীষীদের জন্ম দিয়েছে। এই সমৃদ্ধ পরিবেশেই তিনি **'কানযুল উসূল'** বা উসূলুল বাজদাবীর মতো কালজয়ী গ্রন্থ রচনার যোগ্যতা অর্জন করেন।

---

৪. তিনি কোন ফিকহী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? (ما هو المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه؟)

উত্তর:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী এবং ফিকহী মাযহাবের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 'হানাফি' (الحنفي) মাযহাবের একনিষ্ঠ খাদেম ও ধারক। তাঁকে হানাফি মাযহাবের অন্যতম স্তম্ভ বা 'রুকন' বিবেচনা করা হয়।

হানাফি মাযহাবে তাঁর অবস্থান:

তিনি কেবল একজন সাধারণ অনুসারী (মুকাল্লিদ) ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন 'মুজতাহিদ ফিল মাসাইল' বা 'আসহাবুত তাখরীজ' স্তরের ফকীহ। অর্থাৎ তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উসূল বা মূলনীতির আলোকে নতুন নতুন মাসআলার সমাধান বের করার যোগ্যতা রাখতেন।

মাযহাবের খেদমত:

হানাফি মাযহাবের উসূল বা মূলনীতিগুলো যখন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, তখন ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) সেগুলোকে একত্রিত করে একটি সুশৃঙ্খল শাস্ত্রের রূপ দেন। তাঁর রচিত 'উসূলুল বাজদাবী' কিতাবটি হানাফি মাযহাবের দলিল ও প্রমাণের শ্রেষ্ঠ সংকলন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি ফিকহ কোনো অনুমাননির্ভর মতবাদ নয়, বরং তা কুরআন ও সুন্নাহর শক্তিশালী দলিলে প্রতিষ্ঠিত।

মাযহাব রক্ষায় ভূমিকা:

তৎকালীন সময়ে শাফেয়ী ও মু'তাযিলাদের পক্ষ থেকে হানাফি মাযহাবের ওপর আসা বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের তিনি দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। তিনি তাঁর কিতাবে বারবার উল্লেখ করেছেন:

"وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللهُ"

(এবং এর ওপরই আমাদের আলেমগণের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত।)

সুতরাং, তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের একজন শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র, সংরক্ষক এবং প্রচারক।

---

৫. ইমাম আল-বাজদাবীর বিখ্যাত শায়খ (উস্তাদ) কে? (من هو أشهر شيوخ الإمام البزدوي؟)

উত্তর:

একজন মানুষের মহত্বের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান থাকে তাঁর শিক্ষকদের। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর ইলমী উৎকর্ষতার পেছনে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর অসংখ্য শিক্ষকের মধ্যে কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সর্বপ্রধান উস্তাদ:

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত এবং প্রধান শায়খ ছিলেন 'শামসুল আইম্মাহ' আব্দুল আযীয ইবনে আহমাদ আল-হালওয়ানী (شمس الأئمة الحلواني) (রহ.)। তিনি ছিলেন বুখারার প্রধান ফকীহ এবং হানাফি মাযহাবের তৎকালীন অবিসংবাদিত নেতা। ইমাম আল-বাজদাবী তাঁর নিকট থেকেই ফিকহ ও উসূলের গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

অন্যান্য উস্তাদগণ:

১. শায়খ আবু আলী আল-হাসান ইবনে খিজির আন-নাসাফী (রহ.): তাঁর নিকট থেকেও তিনি ফিকহ শাস্ত্রের জটিল বিষয়গুলো আয়ত্ত করেন।

২. পিতা মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন: তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ও ফিকহী বুনিয়াদ তাঁর পিতার হাতেই গড়ে ওঠে।

উস্তাদের প্রভাব:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁর উস্তাদ শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানী (রহ.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং চিন্তাধারা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর লেখনীতে উস্তাদের যুক্তি ও বিশ্লেষণের ছাপ স্পষ্ট। তিনি তাঁর কিতাবে বিভিন্ন মাসআলায় উস্তাদের রায় বা অভিমতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উদ্ধৃত করেছেন।

আরবিতে বলা হয়:

"تَفَقَّهَ عَلَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ وَأَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمَ وَالْأَدَبَ"

(তিনি শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানীর নিকট ফিকহ শিখেন এবং তাঁর থেকে ইলম ও আদব গ্রহণ করেন।)

মূলত, এই মহান উস্তাদের সোহবতই আল-বাজদাবীকে 'ফখরুল ইসলাম' বা ইসলামের গর্বে পরিণত করেছিল।

---

৬. তাঁর বিখ্যাত ছাত্রবৃন্দ কারা? (من هم أشهر تلاميذه؟)

উত্তর:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) কেবল একজন মহান লেখকই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন সফল শিক্ষক। তাঁর হাতে গড়া ছাত্ররাই পরবর্তী যুগে হানাফি মাযহাবের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর ইলমী দরবারে দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা ভিড় করত।

বিখ্যাত ছাত্রবৃন্দ:

তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে কয়েকজন প্রখ্যাত ছাত্রের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. আবুল ইউসর আল-বাজদাবী (রহ.): সম্পর্কে তিনি ইমামের ছোট ভাই। তিনি নিজেই একজন বড় মাপের ফকীহ ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করে 'সদরুল ইসলাম' উপাধি লাভ করেন।

২. হাসান ইবনে আলী আল-বাজদাবী (রহ.): তিনি ইমামের নিজস্ব সন্তান। পিতার নিকট থেকেই তিনি ফিকহ ও উসূলের শিক্ষা লাভ করেন।

৩. ইমাম নজমউদ্দীন উমর আন-নাসাফী (রহ.): বিখ্যাত 'আকাইদুন নাসাফী' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ইমাম আল-বাজদাবীর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন।

৪. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আস-সারাখসী (রহ.): বিখ্যাত 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের লেখক ইমাম সারাখসী (রহ.) তাঁর সমসাময়িক হলেও কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর ছাত্র হিসেবেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

ছাত্রদের ওপর প্রভাব:

তাঁর ছাত্ররা কেবল ফিকহ শিখেননি, বরং তাঁরা উস্তাদের কাছ থেকে 'ফিকহুন নাফস' বা গভীর বোধশক্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা উস্তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করে মাযহাবের মাসআলাগুলোকে দলিলের ভিত্তিতে শক্তিশালী করেছেন।

আরবিতে বলা হয়:

"تَخَرَّجَ عَلَى يَدَيْهِ جَمْعٌ غَفِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ أَضَاءُوا الدُّنْيَا بِعِلْمِهِمْ"

(তাঁর হাতে এমন একদল আলেম তৈরি হয়েছেন, যাঁরা তাঁদের জ্ঞান দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন।)

---

৭. তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ইলমী উপাধি কী? (ما هو أشهر لقب علمي له؟)

উত্তর:

ইসলামের ইতিহাসে অনেক আলেম তাঁদের মূল নামের চেয়ে লকব বা উপাধিতেই বেশি পরিচিত। ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাজদাবী (রহ.)-ও এর ব্যতিক্রম নন। ইলমী গভীরতা ও মাযহাবের খেদমতের স্বীকৃতিস্বরূপ সমকালীন ওলামায়ে কেরাম তাঁকে এক অনন্য উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

বিখ্যাত উপাধি:

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ও বহুল প্রচলিত উপাধি হলো 'ফখরুল ইসলাম' (فخر الإسلام)। যার অর্থ—'ইসলামের গর্ব'। ইলমী মজলিসে বা কিতাবের পাতায় যখনই 'ফখরুল ইসলাম' বলা হয়, তখন সবার আগে আল-বাজদাবীর কথাই মনে আসে।

উপাধি লাভের কারণ:

১. মাযহাবের প্রতিরক্ষা: হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের যুক্তির প্রভাবে ইসলামি আকিদা ও ফিকহ যখন চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল, তখন তিনি অকাট্য দলিল দিয়ে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন।

২. উসূল শাস্ত্রের সংস্কার: হানাফি উসূলকে তিনি এমন সুশৃঙ্খল রূপ দিয়েছিলেন, যা ইসলামি আইনশাস্ত্রের জন্য গর্বের বিষয় ছিল।

৩. জুহদ ও তাকওয়া: তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং আল্লাহভীরুতা তাঁকে সাধারণ আলেমদের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল।

অন্যান্য উপাধি:

যদিও 'ফখরুল ইসলাম'ই প্রধান, তবুও তাঁকে সম্মান করে 'শায়খুল হানাফিয়্যাহ' (হানাফীদের শায়খ) এবং 'সাহিবুল উসূল' (উসূল গ্রন্থের প্রণেতা) বলেও সম্বোধন করা হয়।

ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী (রহ.) বলেন:

"لُقِّبَ بِفَخْرِ الْإِسْلَامِ لِعُلُوِّ كَعْبِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ"

(ইলম ও আমলে তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁকে 'ফখরুল ইসলাম' উপাধি দেওয়া হয়েছে।)

---

৮. তাঁর ইলমী সফরের গুরুত্ব কী ছিল? (ما هي أهمية رحلاته العلمية؟)

উত্তর:

প্রাচীনকালে আলেমদের জন্য 'রিহলা' বা ইলমী সফর ছিল অপরিহার্য। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.)-ও ইলমের সন্ধানে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রগুলোতে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর এই সফরগুলো তাঁর ইলমী জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

সফরের গুরুত্ব ও ফলাফল:

১. শ্রেষ্ঠ উস্তাদদের সান্নিধ্য লাভ:

তিনি তাঁর জন্মস্থান নাসাফ থেকে বের হয়ে বুখারা (بخارى) এবং সমরকন্দ (سمرقند) ভ্রমণ করেন। এই সফর তাঁকে যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। যদি তিনি সফর না করতেন, তবে হয়ত এই মহান উস্তাদের ইলম থেকে বঞ্চিত হতেন।

২. দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্ততা:

বিভিন্ন অঞ্চলের আলেমদের সাথে মেলামেশা এবং বিতর্ক (মুনাযারা) করার ফলে তাঁর চিন্তাধারায় ব্যাপকতা আসে। তিনি কেবল নিজ অঞ্চলের ফতোয়ার ওপর সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ফিকহী পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।

৩. কিতাব ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ:

তৎকালীন বড় বড় কুতুবখানা বা লাইব্রেরিগুলো ছিল বাগদাদ, বুখারা ও সমরকন্দে। সফরের মাধ্যমে তিনি দুর্লভ সব কিতাব ও পাণ্ডুলিপি পড়ার সুযোগ পান, যা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'উসূলুল বাজদাবী' রচনায় সহায়ক উপাদান জুগিয়েছে।

৪. মাযহাবের প্রচার:

তাঁর সফরের আরেকটি গুরুত্ব হলো, তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই হানাফি ফিকহের দরস দিয়েছেন। ফলে তাঁর মাধ্যমে মধ্য এশিয়ায় হানাফি মাযহাবের ভিত্তি আরও মজবুত হয়েছে।

সারকথা হলো, তাঁর এই সফরগুলো ছিল **'রিহলা ফী তলাবিল ইলম'** (ইলম অন্বেষণের সফর), যা তাঁকে একজন স্থানীয় আলেম থেকে বিশ্ববরেণ্য 'ফখরুল ইসলাম'-এ পরিণত করেছে।

---

৯. উসূল ব্যতীত তাঁর অন্যান্য প্রধান গ্রন্থাবলি কী কী? (ما هي أبرز مؤلفاته غير الأصول؟)

উত্তর:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) মূলত তাঁর অমর গ্রন্থ 'কানযুল উসূল' (যা 'উসূলুল বাজদাবী' নামে খ্যাত)-এর জন্য পরিচিত। কিন্তু তাঁর লেখনী কেবল উসূল শাস্ত্রেই

সীমাবদ্ধ ছিল না। ফিকহ, তাফসির এবং হাদিস শাস্ত্রেও তিনি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

উসূল ব্যতীত অন্যান্য প্রধান গ্রন্থাবলি:

১. আল-মাবসূত (المبسوط):

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মূল কিতাবের ওপর ভিত্তি করে তিনি **১১** খণ্ডে এই বিশাল ফিকহী বিশ্বকোষ রচনা করেন। এটি হানাফি ফিকহের মাসআলাগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার ভান্ডার। ইমাম সারাখসীর মাবসূতের মতোই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. শারহুল জামি' আল-কাবীর (شرح الجامع الكبير):

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর 'আল-জামি' আল-কাবীর' গ্রন্থের একটি চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এতে তিনি মাসআলাগুলোর পেছনের দলিল ও যুক্তি তুলে ধরেছেন।

৩. শারহুল জামি' আস-সাগীর (شرح الجامع الصغير):

এটিও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর কিতাবের ব্যাখ্যা। ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি প্রাথমিক ও অপরিহার্য গ্রন্থ।

৪. কাশফুল আসরার (كشف الأسرار):

যদিও এটি তাঁর রচিত নয়, তবে তিনি ফিকহের গূঢ় রহস্য নিয়ে অনেক স্বতন্ত্র রিসালা বা পুস্তিকা লিখেছিলেন যা পরবর্তী লেখকদের প্রভাবিত করেছে।

৫. গিনায়াতুল ফুকাহা (غنية الفقهاء):

ফকীহদের জন্য প্রয়োজনীয় মাসআলা সম্বলিত একটি গ্রন্থ।

লেখনীর বৈশিষ্ট্য:

তাঁর প্রতিটি কিতাবেই তিনি 'তরিকাতুল ফুকাহা' (ফকীহদের পদ্ধতি) অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি মাসআলার সাথে উসূলের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

আরবিতে তাঁর অবদান সম্পর্কে বলা হয়:

"لَهُ مُصَنَّفَاتٌ جَلِيلَةٌ فِي الْفِقْهِ تَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ فِي الْمَذْهَبِ"

(ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর মহৎ রচনাবলী রয়েছে যা মাযহাবে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দেয়।)

---

১০. তাঁর সময়ে তাঁর ইলমী মর্যাদা কেমন ছিল? (ما هي مكانته العلمية في عصره؟)

উত্তর:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) যে যুগে জীবিত ছিলেন, তা ছিল ইলমের এক প্রতিযোগিতামুখর যুগ। সেই সময়ে বুখারা ও সমরকন্দে শত শত বড় আলেম ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সবার মাঝে তিনি ছিলেন সূর্যের মতো উজ্জ্বল।

সমকালীন ইলমী মর্যাদা:

১. হানাফিদের অবিসংবাদিত নেতা (রঈসুল হানাফিয়্যাহ):

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি ছিলেন মা ওয়ানারান নাহার (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) অঞ্চলের হানাফি আলেমদের সর্দার বা 'রঈস'। বড় কোনো মাসআলায় আলেমগণ আটকে গেলে তাঁর দিকেই তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর ফতোয়াই ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

২. মুজতাহিদ ফীল মাযহাব:

সমকালীন ওলামায়ে কেরাম তাঁকে সাধারণ মুকাল্লিদ মনে করতেন না। বরং তাঁকে 'আসহাবুত তাখরীজ' বা মুজতাহিদ স্তরের ফকীহ হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উসূল প্রয়োগ করে নতুন সমস্যার সমাধান দিতেন।

৩. বিতর্কের ময়দানে অপরাজেয়:

সে যুগে শাফেয়ী ও মু'তাযিলাদের সাথে প্রচুর মুনাযারা বা বিতর্ক হতো। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও অগাধ ইলমের কারণে বিতর্কে সর্বদা বিজয়ী হতেন। কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতে সাহস পেত না।

৪. সকলের শ্রদ্ধার পাত্র:

শুধু হানাফী নন, বরং অন্য মাযহাবের আলেমরাও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর তাকওয়া ও পরহেজগারিতা তাঁকে সর্বজনমান্য ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল।

ঐতিহাসিক ইবনে কুতলুবুগা (রহ.) বলেন:

"كَانَ إِمَامًا كَبِيرًا، مُحَقِّقًا، مُدَقِّقًا، رَحَلَ إِلَيْهِ الطُّلَّابُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ"

(তিনি ছিলেন মহান ইমাম, সত্যানুসন্ধানী ও সূক্ষ্মদর্শী। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে ছুটে আসত।)

---

১১. তাঁর প্রশংসায় একজন আলেমের বক্তব্য উল্লেখ কর। (اذكر قول أحد العلماء في مدحه)

উত্তর:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) ছিলেন হানাফি মাযহাবের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সমকালীন ও পরবর্তী যুগের প্রায় সকল বড় আলেম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর ইলম, আমল ও তাকওয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর শানে অসংখ্য মনীষী বক্তব্য দিয়েছেন, যা থেকে তাঁর উচ্চ মর্যাদা অনুমান করা যায়।

ইমাম আব্দুল কাদির আল-কুরাশী (রহ.)-এর বক্তব্য:

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও 'আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ' গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম আব্দুল কাদির আল-কুরাশী (রহ.) ইমাম আল-বাজদাবীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

" كَانَ إِمَامًا، فَقِيهًا، أُصُولِيًّا، مُدَقِّقًا، مُحَقِّقًا، غَوَّاصًا عَلَى الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ، رَحَلَ إِلَيْهِ الطُّلَّابُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ"

(অর্থ: তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম, ফকীহ, উসূলবিদ, সূক্ষ্মদর্শী ও সত্যানুসন্ধানী। তিনি গভীর ও সূক্ষ্ম অর্থ উদ্ধারে ডুবুরির মতো পারদর্শী ছিলেন। চারদিক থেকে ছাত্ররা ইলম অর্জনের জন্য তাঁর নিকট সফর করে আসত।)

আল্লামা ইবনে কুতলুবুগা (রহ.)-এর প্রশংসা:

তিনি বলেন, ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী ছিলেন "শায়খুল হানাফিয়্যাহ" (হানাফীদের শায়খ) এবং তাঁর কিতাবগুলো হানাফি মাযহাবের দলিল হিসেবে গৃহীত। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি ছিলেন "সাহিবুল কারামাত" বা কারামতের অধিকারী।

প্রশংসার তাৎপর্য:

এই বক্তব্যগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল একজন কিতাবী আলেম ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন 'রুসুখ ফীল ইলম' (গভীর পাণ্ডিত্য)-এর অধিকারী। বিশেষ করে "গাওয়াস" (ডুবুরি) শব্দটি ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি শরীয়তের জাহেরি বা বাহ্যিক বিধানের নিচে লুকিয়ে থাকা বাতেনি হিকমতগুলো বের করে আনতে সক্ষম ছিলেন। একারণেই তাঁকে 'ফখরুল ইসলাম' বা ইসলামের গর্ব বলা হয়।

---

১২. তাঁর প্রধান বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র কী ছিল? (ما هو مجال تخصصه الرئيسي؟)

উত্তর:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাফসির, হাদিস, কালাম শাস্ত্র এবং আরবি সাহিত্যে তাঁর দখল ছিল ঈর্ষণীয়। তবে তাঁর ইলমী জীবনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু বা বিশেষজ্ঞতার মূল ক্ষেত্র ছিল দুটি— 'ইলমুল ফিকহ' এবং 'উসূলুল ফিকহ'।

বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রসমূহ:

১. উসূলুল ফিকহ (Islamic Legal Theory):

এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞতার জায়গা। তিনি হানাফি উসূলকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের রূপ দেন। তাঁর রচিত 'কানযুল উসূল' বা উসূলুল বাজদাবী এই শাস্ত্রের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। তিনি ফিকহী মাসআলা থেকে উসূল বের করার পদ্ধতি (তাখরীজুল উসূল আলাল ফুরু)-তে অদ্বিতীয় ছিলেন।

২. ফুরু'আত বা ফিকহ (Islamic Jurisprudence):

উসূলের পাশাপাশি ফিকহী মাসআলা বা ফুরু'আতেও তিনি ছিলেন 'ইমামুয যামান' (যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম)। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর 'মাবসূত' ও 'জামি' আল-কাবীর'-এর ওপর তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো প্রমাণ করে যে, হানাফি মাযহাবের খুঁটিনাটি মাসআলায় তাঁর কত গভীর দখল ছিল।

৩. মুনাযারা বা বিতর্কশাস্ত্র (Dialectics):

তাঁর বিশেষজ্ঞতার আরেকটি বিশেষ দিক ছিল 'ইলমুল খিলাফ' বা বিতর্কশাস্ত্র। বিরোধীদের (বিশেষ করে মু'তাযিলা ও শাফেয়ী) যুক্তি খণ্ডনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর যুক্তিগুলো ছিল অকাট্য বা 'বুরহানুন কাতি'উন'।

আরবিতে তাঁর বিশেষজ্ঞতা সম্পর্কে বলা হয়:

"انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ فِي بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ"

(মা ওয়ানারান নাহার অঞ্চলে ফিকহ ও উসূলে হানাফিদের নেতৃত্ব তাঁর ওপর এসেই শেষ হয়েছে।)

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন ফিকহ ও উসূলের সমন্বয়ে গঠিত এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

---

১৩. ইমাম আল-বাজদাবী কখন ইন্তেকাল করেন? (متى توفي الإمام البزدوي؟)

উত্তর:

ইলমের এই মহান সূর্য সারাজীবন জ্ঞান বিতরণের পর হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে অস্তমিত হয়। তাঁর মৃত্যু মুসলিম বিশ্বের, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের জন্য ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি।

মৃত্যু সন ও তারিখ:

অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতে, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) ৪৮২ হিজরী সনের ৫ই জমাদিউল উলা (বৃহস্পতিবার) ইন্তেকাল করেন। ইংরেজি সাল অনুযায়ী তা ছিল আনুমানিক ১০৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

মৃত্যুর স্থান ও দাফন:

তিনি ইলমের নগরী সমরকন্দ (Samarkand)-এ ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সমরকন্দের বিখ্যাত কবরস্থান 'জাকারদিযাহ' (الجاكردیزة)-তে দাফন করা হয়। এটি ছিল উলামা ও মাশায়েখদের কবরস্থান। তিনি ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদী (রহ.)-এর সমাধির সন্নিকটে শায়িত আছেন।

জানাজার অবস্থা:

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমরকন্দ ও বুখারার ইলমী অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর জানাজায় অসংখ্য আলেম, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বলা হয়, তাঁর জানাজার দিনটি ছিল ইলম হারানোর দিন।

ভাইয়ের পাশে দাফন:

তাঁর ছোট ভাই সদরুল ইসলাম আবুল ইউসর আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁকে দাফন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁকেও তাঁর বড় ভাইয়ের পাশেই দাফন করা হয়। দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে আছেন, যারা জীবদ্দশায় একসাথে ইলমের খেদমত করেছেন।

ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে লিখেন:

"مَاتَ بِسَمَرْقَنْدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمائَةٍ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى"

(তিনি ৪৮২ হিজরীতে সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।)

---

১৪. ফিকহে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান কী? (ما هو أهم منقبة له في الفقه؟)

উত্তর:

হানাফি ফিকহের ইতিহাসে ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর অবদান কেবল কিতাব রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি হানাফি ফিকহকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান:

১. ফিকহ ও উসূলের সমন্বয় (التطبيق بين الفقه والأصول):

তাঁর পূর্বে ফিকহ ও উসূল অনেক ক্ষেত্রে আলাদাভাবে চর্চা হতো। কিন্তু আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁর লেখনী ও পাঠদানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ফিকহের প্রতিটি মাসআলার পেছনে শক্তিশালী উসূল বা মূলনীতি রয়েছে। তিনি "তাখরীজুল উসূল আলাল ফুরু" (শাখা থেকে মূলনীতি বের করা) পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

২. মাযহাবের রক্ষণাবেক্ষণ (نصرة المذهب):

সে যুগে মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের প্রভাবে অনেক মানুষ হানাফি ফিকহ নিয়ে সংশয়ে ছিল। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) অকাট্য দলিল ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইজতিহাদগুলো কুরআন ও সুন্নাহর গভীরতম নির্যাস। তিনি মাযহাবের ওপর আসা সকল অভিযোগ খণ্ডন করেন।

৩. প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা:

তাঁর রচিত 'উসূলুল বাজদাবী' হানাফি ফিকহের সংবিধান স্বরূপ। প্রায় এক হাজার বছর ধরে এটি মাদরাসাগুলোর পাঠ্যবই হিসেবে হানাফি ফিকহের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে আসছে।

৪. মুজতাহিদ তৈরি করা:

তিনি এমন একদল ছাত্র তৈরি করে গিয়েছিলেন, যারা পরবর্তীতে হানাফি মাযহাবের পতাকাবাহী হয়েছেন। যেমন—ইমাম উমর আন-নাসাফী।

তাঁর অবদান সম্পর্কে বলা হয়:

"لَوْلَا الْبَزْدَوِيُّ لَمَا فُهِمَتْ أُصُولُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا الصَّحِيحِ"

(যদি বাজদাবী না থাকতেন, তবে হানাফি উসূল তার সঠিক রূপে বোঝা যেত না।)

১৫. তাঁর ইলমী প্রতিপালনের ধরন কেমন ছিল? (ما هي طبيعة نشأته العلمية؟)

উত্তর:

একজন মহামনীষী গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের প্রতিপালন বা 'নাশআত' (النَّشْأَةُ) সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর ইলমী প্রতিপালন ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহ্যবাহী।

ইলমী প্রতিপালনের প্রকৃতি:

১. বাইতুল ইলম (ইলমের ঘর):

তাঁর প্রতিপালন শুরু হয় এমন এক ঘরে, যা ছিল ইলমের খনি। তাঁর পিতা, দাদা, প্রপিতামহ—সবাই ছিলেন বড় আলেম। শিশুকালেই তিনি ঘরে ফিকহ ও হাদিসের চর্চা দেখেছেন। এই পারিবারিক ঐতিহ্য বা 'wirathah ilmiyyah' (ইলমী উত্তরাধিকার) তাঁর রক্তে মিশে ছিল।

২. দিরায়াত বা বোধশক্তির ওপর গুরুত্ব:

তাঁর প্রতিপালনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—শুধুমাত্র রিওয়ায়াত (বর্ণনা) বা মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভর না করে দিরায়াত (গভীর উপলব্ধি)-এর ওপর জোর দেওয়া। তাঁর শিক্ষকরা তাঁকে শিখিয়েছিলেন কোনো মাসআলা শোনার পর প্রশ্ন করতে: "লিমা" (কেন?) এবং "কাইফা" (কীভাবে?)। এটি তাঁকে গবেষক হিসেবে গড়ে তোলে।

৩. যুহদ ও তাকওয়ার সংমিশ্রণ:

তাঁর ইলমী প্রতিপালন কেবল শুষ্ক জ্ঞানের চর্চা ছিল না। বরং এর সাথে ছিল আমল, যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) এবং তাকওয়ার সংমিশ্রণ। তিনি ইলমকে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, জীবিকার মাধ্যম হিসেবে নয়।

৪. উদার দৃষ্টিভঙ্গি:

বিভিন্ন অঞ্চলের শায়খদের সোহবত এবং ইলমী সফরের কারণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। তিনি সংকীর্ণতামুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠেন, যা তাঁকে হানাফি মাযহাবের গোঁড়ামি থেকে রক্ষা করে দলিলের অনুসারী বানিয়েছিল।

সংক্ষেপে, তাঁর ইলমী প্রতিপালন ছিল—**"ইলম, আমল এবং আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব সমন্বয়"**, যা তাঁকে যুগের শ্রেষ্ঠ **'ফখরুল ইসলাম'**-এ পরিণত করেছিল।

উসূলুল বাজদাবী : আল ইজমা

১৬. আভিধানিকভাবে ইজমা কী? (ما هو الإجماع لغةً؟)

উত্তর:

ইসলামি শরীয়তের অন্যতম উৎস হলো 'ইজমা' বা ঐকমত্য। শরীয়তের পরিভাষায় প্রবেশের আগে এর আভিধানিক অর্থ জানা অত্যন্ত জরুরি, কারণ আভিধানিক অর্থের ওপর ভিত্তি করেই পারিভাষিক সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে।

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):

আরবি 'ইজমা' (الْإِجْمَاعُ) শব্দটি 'বাব-ই-ইফ'আল'-এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এর মূল ধাতু হলো 'জিম-মিম-আইন' (ج-م-ع)। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর দুটি প্রধান অর্থ রয়েছে:

১. দৃঢ় সংকল্প করা (العزم):

যখন কেউ কোনো কাজ করার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প করে, তখন আরবীতে বলা হয় 'আজমা'আ' (أَجْمَعَ)।

- **কুরআনের দলিল:** আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনায় বলেন:

"فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ" (সূরা ইউনুস: ৭১)

(অর্থ: তোমরা তোমাদের কাজের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ কর এবং তোমাদের শরীকদের ডাকো।)

- **হাদিসের দলিল:** রাসূল (সা.) বলেছেন:

"مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ"

(যে ফজরের আগে রোজার নিয়ত বা সংকল্প করল না, তার রোজা হবে না।)

২. একমত হওয়া (الإنفاق):

যখন একদল লোক কোনো বিষয়ে একই মত পোষণ করে বা একমত হয়। যেমন বলা হয়:

"أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا"

(লোকেরা অমুক বিষয়ে একমত হয়েছে।)

বিশ্লেষণ:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর মতে, ইজমার মধ্যে এই দুটি অর্থই পাওয়া যায়। কারণ, মুজতাহিদগণ যখন ইজমা করেন, তখন তাঁরা একে অপরের সাথে 'একমত' হন এবং সেই বিধানটি বাস্তবায়নের 'দৃঢ় সংকল্প' করেন। তবে উসূল শাস্ত্রের আলোচনায় 'একমত হওয়া' অর্থটিই বেশি প্রাধান্য পায়।

---

১৭. শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ইজমা কী? (ما هو الإجماع شرعاً؟)

উত্তর:

শরীয়তের দলিল চতুষ্টয়ের (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) মধ্যে ইজমার স্থান তৃতীয়। কুরআন ও সুন্নাহর পরেই এর মর্যাদা। পারিভাষিক সংজ্ঞার মাধ্যমে এর প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي):

উসূলবিদগণের পরিভাষায় ইজমা বলা হয়:

"اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ شَرْعِيٍّ"

(অর্থ: উম্মতে মুহাম্মাদীর মুজতাহিদগণের কোনো এক যুগে কোনো একটি শরয়ী হুকুম বা বিষয়ের ওপর একমত হওয়া।)

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা ও শর্তাবলি:

এই সংজ্ঞায় ইজমা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আরোপ করা হয়েছে:

১. ইত্তেফাক (ঐকমত্য): কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলে চলবে না, বরং সেই যুগের সকল যোগ্য মুজতাহিদের একমত হতে হবে। একজনের দ্বিমত থাকলেও ইজমা হবে না।

২. মুজতাহিদীন: সাধারণ মানুষ বা আওয়ামের একমত হওয়া ধর্তব্য নয়। কেবল ফিকহ ও ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন আলেমদের মতই গ্রহণযোগ্য। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, ফকীহ নন এমন ব্যক্তির মত ইজমার ক্ষেত্রে গণ্য হবে না।

৩. উম্মতে মুহাম্মাদী: অন্য কোনো নবীর উম্মতের ইজমা আমাদের জন্য দলিল নয়। ইজমা কেবল এই উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৪. শরয়ী বিষয়: ইজমা হতে হবে দ্বীনি বা শরয়ী বিষয়ে। জাগতিক কোনো বিষয়ে (যেমন—যুদ্ধকৌশল বা কৃষিকাজ) একমত হওয়াকে উসূলের পরিভাষায় ইজমা বলা হয় না।

আল-বাজদাবীর মন্তব্য:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, ইজমা হলো সত্যের মাপকাঠি। আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে ভ্রষ্টতার ওপর একত্রিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তাই ইজমা অকাট্য দলিল বা 'হুজ্জাতুন কাতিয়া'।

---

১৮. ইজমায়ে যরূরী (অপরিহার্য ঐকমত্য) অস্বীকারকারীর বিধান কী? (ما هو حكم منكر الإجماع الضروري؟)

উত্তর:

ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বিধানের মর্যাদা সব ক্ষেত্রে সমান নয়। এর দলিলের শক্তির ওপর ভিত্তি করে ইজমাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হলো 'ইজমায়ে যরূরী' বা 'ইজমায়ে মুতাওয়াতির'। এটি অস্বীকার করার বিধান অত্যন্ত কঠোর।

ইজমায়ে যরূরী বা মুতাওয়াতির:

যে ইজমা সাহাবীগণের যুগে হয়েছে এবং তা আমাদের পর্যন্ত মুতাওয়াতির বা অকাট্য সূত্রে পৌঁছেছে। অথবা দ্বীনের এমন স্বতঃসিদ্ধ বিষয় (যেমন—পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, কুরআনের প্রামাণ্যতা) যার ব্যাপারে উম্মতের কারোর কোনো দ্বিমত নেই। একে "আল-মা'লুমু মিনাদ্দীনি বিদ্-দরূপরাহ" বলা হয়।

অস্বীকারকারীর বিধান (حكم المنكر):

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) ও জমহুর হানাফি ফকীহগণের মতে:

"مَنْ أَنْكَرَ إِجْمَاعًا مَقْطُوعًا بِهِ يَكْفُرُ"

(যে ব্যক্তি অকাট্য ইজমা অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।)

কারণ:

১. এই ধরনের ইজমা অস্বীকার করা মানে হলো পরোক্ষভাবে রাসূল (সা.)-এর আনীত বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

২. এটি কুরআনের আয়াত অস্বীকার করার শামিল। কারণ আল্লাহ মুমিনদের পথের বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন (সূরা নিসা: ১১৫)।

উদাহরণ:

কেউ যদি বলে "যোহরের নামাজ ৪ রাকাত নয়" অথবা "মদ হালাল"—তবে সে কাফের হবে। কারণ এই বিষয়গুলো ইজমায়ে যরূরী দ্বারা প্রমাণিত।

অন্যান্য ইজমার ক্ষেত্রে:

তবে যদি ইজমাটি মুতাওয়াতির না হয় (যেমন—পরবর্তী যুগের ইজমা বা ইজমা সুকূতি), তবে তা অস্বীকারকারী কাফের হবে না, বরং 'গুমরাহ' (পথভ্রষ্ট) ও 'বিদ'আতী' হবে। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাকফীরের (কাফের বলার) ক্ষেত্রে এই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

১৯. ইজমা সুকূতি (নীরব ঐকমত্য) কী? (ما هو الإجماع السكوتي؟)

উত্তর:

ইজমা বা ঐকমত্য প্রকাশের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: ইজমায়ে সরীহ (প্রকাশ্য) এবং ইজমায়ে সুকূতি (নীরব)। হানাফি উসূলে ইজমায়ে সুকূতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত বিষয়।

সংজ্ঞা:

যখন কোনো যুগের একজন বা কয়েকজন মুজতাহিদ কোনো শরয়ী মাসআলায় ফতোয়া প্রদান করেন বা কোনো রায় ব্যক্ত করেন এবং সেই যুগের অন্যান্য মুজতাহিদগণ তা জানার পর কোনো প্রতিবাদ না করে চুপ থাকেন, তখন তাকে 'ইজমা সুকূতি' (الإجماع السكوتي) বলা হয়।

হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এবং হানাফি ফকীহগণের মতে, ইজমা সুকূতি একটি গ্রহণযোগ্য দলিল এবং এটিও ইজমার অন্তর্ভুক্ত।

- **যুক্তি:** মুজতাহিদগণ হলেন দ্বীনের রক্ষক। যদি তাঁরা কোনো ভুল বা বাতিল ফতোয়া দেখেন, তবে প্রতিবাদ করা তাঁদের ওপর ওয়াজিব (ফরযে কিফায়া)। এমতাবস্থায় চুপ থাকা মানে হলো তাঁরা মনে মনে ওই ফতোয়ার সাথে একমত। শরীয়তের মূলনীতি হলো:

"السُّكُوتُ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ"

(প্রয়োজনের সময় চুপ থাকা সম্মতির লক্ষণ বা বর্ণনা হিসেবে গণ্য।)

শর্তাবলি:

ইজমা সুকূতি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে:

১. মাসআলাটি সম্পর্কে অন্যান্য মুজতাহিদদের অবশ্যই জানতে হবে।

২. চুপ থাকার সময়কালটি চিন্তাভাবনা করার জন্য যথেষ্ট হতে হবে।

৩. চুপ থাকার পেছনে কোনো ভয়ভীতি বা জোরজবরদস্তি (তাকিয়্যা) থাকা যাবে না।

শাফেয়ী মতের সাথে পার্থক্য:

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইজমা সুকূতিকে দলিল মানেন না। তাঁর মতে, "চুপ থাকা ব্যক্তির দিকে কোনো কথা বা মত সম্পৃক্ত করা যায় না।" কিন্তু হানাফিগণ বলেন, মুজতাহিদ সত্য গোপন করতে পারেন না, তাই তাঁর নীরবতা সম্মতিই প্রমাণ করে।

---

২০. ইজমার ভিত্তি বা "মুসতানাদ" কী? (ما هو مستند الإجماع؟)

উত্তর:

ইজমা কোনো আকাশকুসুম কল্পনা বা ভিত্তিহীন বিষয় নয়। মুজতাহিদগণ খেয়ালখুশি মতো একমত হতে পারেন না। প্রতিটি ইজমার পেছনে অবশ্যই শরীয়তের কোনো না কোনো দলিল থাকতে হয়, যাকে উসূলের পরিভাষায় 'মুসতানাদুল ইজমা' (مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ) বা ইজমার ভিত্তি বলা হয়।

মুসতানাদের প্রকারভেদ:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর মতে, ইজমার ভিত্তি প্রধানত তিন ধরনের হতে পারে:

১. কুরআন বা কিতাবুল্লাহ:

কখনও কখনও কুরআনের কোনো আয়াতের ওপর ভিত্তি করে ইজমা হয়। যদিও আয়াত থাকার পর ইজমার দরকার হয় না, কিন্তু ইজমা সেই আয়াতের হুকুমকে আরও মজবুত ও অকাট্য করে।

- **উদাহরণ:** আপন মায়ের সাথে বিবাহ হারাম—এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে, যার ভিত্তি কুরআনের আয়াত **"হুররিমাত আলাইকুম উম্মাহাতুকুম"**।

২. সুন্নাহ বা হাদিস:

অধিকাংশ ইজমার ভিত্তি হলো সুন্নাহ। রাসূল (সা.)-এর কোনো কথা বা কাজের ওপর ভিত্তি করে সাহাবীগণ একমত হয়েছেন।

- **উদাহরণঃ** দাদীর মিরাস বা অংশ পাওয়ার ব্যাপারে ইজমা। এর ভিত্তি ছিল রাসূল (সা.)-এর একটি হাদিস যা মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বর্ণনা করেছিলেন।

৩. কিয়াস বা ইজতিহাদঃ

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর মতে, কিয়াস বা ইজতিহাদও ইজমার ভিত্তি হতে পারে। এটি হানাফি মাযহাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

- **উদাহরণঃ** হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতের ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা। এর ভিত্তি ছিল কিয়াস—**"রাসূল (সা.) তাঁকে আমাদের দ্বীনের (নামাজের) ইমাম বানিয়েছেন, তাই আমরা তাঁকে আমাদের দুনিয়ার ইমাম বানালাম।"**

গুরুত্বঃ

মুসতানাদ ছাড়া ইজমা দাবি করা ভুল। ইমাম আল-বাজদাবী বলেন, "ইজমা কোনো নতুন বিধান তৈরি করে না, বরং এটি দলিলের সত্যতাকে নিশ্চিত করে।"

উসূলুল বাজদাবী : আল কিয়াস

২১. শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কিয়াস কী? (ما هو القياس شرعا؟)

উত্তর:

ইসলামি শরীয়তের দলিল চতুষ্টয়ের চতুর্থ উৎস হলো 'কিয়াস'। কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার পর নতুন মাসআলা সমাধানের জন্য কিয়াস অপরিহার্য। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ জানা অত্যন্ত জরুরি।

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):

আরবি 'কিয়াস' (الْقِيَاسُ) শব্দটি 'কায়সুন' (قَيْسٌ) মূলধাতু থেকে এসেছে। আভিধানিক অর্থে এর দুটি প্রয়োগ রয়েছে:

১. পরিমাপ করা (التقدير): যেমন বলা হয়, "قِسْتُ الْأَرْضَ بِالْمِتْرِ" (আমি মিটার দিয়ে জমি পরিমাপ করলাম)।

২. তুলনা করা (المساواة): দুই বস্তুর মধ্যে সমতা বিধান করা।

শরয়ী সংজ্ঞা (التعريف الشرعي):

উসূলবিদগণের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয়:

"تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ لِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ بَيْنَهُمَا"

(অর্থ: মূল বিষয় (আসল) এবং নতুন বিষয় (ফার')-এর মধ্যে বিদ্যমান অভিন্ন কারণের (ইল্লত) ভিত্তিতে মূল বিষয়ের হুকুম বা বিধানকে নতুন বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা।)

ইমাম আল-বাজদাবীর মত:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, কিয়াস কোনো নতুন বিধান তৈরি করে না। বরং এটি লুকায়িত বিধানকে প্রকাশ করে মাত্র। তাঁর ভাষায়:

"الْقِيَاسُ مَظْهَرٌ لَا مُثْبِتٌ"

(কিয়াস বিধান প্রকাশকারী, বিধান সাব্যস্তকারী নয়।)

উদাহরণ:

মদ (আসল) হারাম, কারণ এতে নেশা (ইল্লত) আছে। হিরোইন বা ইয়াবা (ফার') সম্পর্কে কুরআনে সরাসরি বলা নেই। কিন্তু এতেও নেশা আছে। তাই মদের ওপর কিয়াস করে হিরোইনকেও হারাম বলা হয়।

---

২২. কিয়াসের রুকন বা মৌলিক অংশগুলো কী কী? (ما هي أركان القياس؟)

উত্তর:

কিয়াস একটি সুশৃঙ্খল আইনি প্রক্রিয়া। চাইলেই যে কোনো জিনিসের সাথে তুলনা করে বিধান দেওয়া যায় না। একটি শুদ্ধ কিয়াস গঠিত হওয়ার জন্য ৪টি মৌলিক স্তম্ভ বা 'রুকন' থাকা অপরিহার্য। এর কোনোটি বাদ পড়লে কিয়াস বাতিল বা 'ফাসিদ' বলে গণ্য হবে।

কিয়াসের ৪টি রুকন (أركان القياس):

১. আল-আসল (الأصل):

মূল বিষয় বা ভিত্তি, যার বিধান কুরআন বা হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। একে 'মাকীস আলাইহি' (যার ওপর কিয়াস করা হয়)-ও বলা হয়।

- **উদাহরণ:** মদ (যার হারাম হওয়ার কথা কুরআনে আছে)।

২. আল-ফার' (الفرع):

শাখা বা নতুন বিষয়, যার বিধান কুরআন বা হাদিসে সরাসরি নেই এবং যার বিধান বের করা মুজতাহিদের উদ্দেশ্য। একে 'মাকীস' (যাকে কিয়াস করা হয়)-ও বলা হয়।

- **উদাহরণ:** হিরোইন বা নতুন মাদকদ্রব্য।

৩. হুকুমুল আসল (حكم الأصل):

আসলের বা মূল বিষয়ের সেই বিধান, যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত (যেমন— ওয়াজিব, হারাম, হালাল)। এই বিধানটিই ফার'-এ স্থানান্তরিত হবে।

- **উদাহরণ:** হারাম হওয়া।

৪. আল-ইল্লত (العلة):

সেই বিশেষ কারণ বা বৈশিষ্ট্য, যার জন্য আসলের ওপর ওই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং যা ফার'-এর মধ্যেও বিদ্যমান।

- **উদাহরণ:** ইসকার বা নেশাগ্রস্ততা।

শর্ত:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, এই চারটি রুকন সঠিক হওয়ার জন্য ইল্লতটি অবশ্যই শরীয়তসম্মত এবং মুতা'আদ্দী (সংক্রামক) হতে হবে, অর্থাৎ যা আসল থেকে ফার'-এ যেতে পারে।

---

২৩. কিয়াসের ক্ষেত্রে "ইল্লত" বা কারণ কী? (ما هي العلة في القياس؟)

উত্তর:

কিয়াসের প্রাণ বা রূহ হলো 'ইল্লত'। ইল্লত ছাড়া কিয়াস কল্পনাও করা যায় না। এটিই সেই যোগসূত্র যা মূল বিষয় (আসল) এবং নতুন বিষয়ের (ফার') মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে।

ইল্লতের পরিচয়:

'ইল্লত' (الْعِلَّةُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ রোগ বা কারণ। উসূলের পরিভাষায় ইল্লত বলা হয়:

"الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي بَنَى الشَّارِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمَ"

(অর্থ: এমন স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যার ওপর ভিত্তি করে শরীয়ত প্রণেতা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল) কোনো বিধান দিয়েছেন।)

ভূমিকা ও গুরুত্ব:

১. সেতুবন্ধন: ইল্লত আসল ও ফার'-এর মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে। ইল্লত আছে বলেই আসলের হুকুম ফার'-এ যায়।

২. হুকুমের আবর্তন: উসূলের নীতি হলো—"الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ" (ইল্লত যেখানে থাকবে, হুকুমও সেখানে থাকবে)। ইল্লত না থাকলে হুকুম থাকবে না।

প্রকারভেদ:

ইল্লত দুইভাবে জানা যায়:

- **ইল্লত মানসুসা:** যা কুরআন বা হাদিসে সরাসরি বলা হয়েছে। যেমন—"মদ হারাম, কারণ তা শয়তানের কাজ।"
- **ইল্লত মুস্তামবাতা:** যা মুজতাহিদ গবেষণার মাধ্যমে বের করেন। যেমন—সুদের ইল্লত 'ওজন করা' বা 'খাদ্য হওয়া'।

আল-বাজদাবীর শর্ত:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, ইল্লতকে অবশ্যই 'মুতা'আদ্দী' (Transitive) হতে হবে। যে ইল্লত কেবল আসলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (কাসিরাহ), তা দিয়ে কিয়াস করা জায়েজ নেই।

---

২৪. কিয়াসের ক্ষেত্রে "আসল" (মূল) এবং "ফার'য়ু" (শাখা)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الأصل والفرع في القياس؟)

উত্তর:

কিয়াসের কাঠামোতে 'আসল' ও 'ফার' দুটি অপরিহার্য রুকন। এদের সম্পর্ক হলো পিতা ও পুত্রের মতো অথবা মূল ও শাখার মতো। এদের মধ্যকার পার্থক্য বোঝা কিয়াসের পদ্ধতি বোঝার জন্য জরুরি।

পার্থক্যসমূহ:

পার্থক্যের বিষয়	আল-আসল (الأصل)	আল-ফার' (الفرع)
সংজ্ঞা	যার বিধান কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা দ্বারা সরাসরি	যার বিধান সরাসরি নসে নেই, বরং কিয়াসের মাধ্যমে বের করা হয়। একে শাখা বলা হয়।

	প্রমাণিত। একে ভিত্তি বলা হয়।	
অবস্থান	এটি 'মাকীস আলাইহি' (যার সাথে তুলনা করা হয়)।	এটি 'মাকীস' (যাকে তুলনা করা হয়)।
হুকুমের উৎস	এর হুকুম ওহী বা নস থেকে প্রাপ্ত।	এর হুকুম আসলের হুকুম থেকে প্রাপ্ত (ইল্লতের মাধ্যমে)।
পূর্বশর্ত	এটি আগে থেকেই শরীয়তে বিদ্যমান থাকে।	এটি নতুন উদ্ভূত সমস্যা বা বিষয়।
উদাহরণ	মদ (Wine) - যার হুকুম স্পষ্ট।	ইয়াবা/মাদক (Drug) - যার হুকুম বের করতে হয়।

সম্পর্ক:

আসল হলো হুকুমের দাতা, আর ফার' হলো হুকুমের গ্রহীতা। আর ইল্লত হলো এই দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যম। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, ফার'-এর মধ্যে আসলের ইল্লতটি হুবহু পাওয়া যাওয়া জরুরি, কম বা বেশি হলে কিয়াস হবে না।

---

২৫. কিয়াসুল জালি (প্রকাশ্য কিয়াস) কী? (ما هو القياس الجلي؟)

উত্তর:

ইল্লত বা কারণের স্পষ্টতার ওপর ভিত্তি করে কিয়াস প্রধানত দুই প্রকার: কিয়াসুল জালি এবং কিয়াসুল খফি। কিয়াসুল জালি হলো সাধারণ ও স্বাভাবিক কিয়াস যা সহজেই বোধগম্য হয়।

সংজ্ঞা:

'জালি' (الْجَلِيُّ) অর্থ স্পষ্ট বা প্রকাশ্য। উসূলের পরিভাষায়:

"هُوَ مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ ظَاهِرَةً وَمُتَبَادِرَةً إِلَى الْفَهْمِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ عَمِيقٍ"

(অর্থ: যে কিয়াসের ইল্লত বা কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং যা সহজেই বুদ্ধিতে আসে, গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয় না, তাকে কিয়াসুল জালি বলে।)

বৈশিষ্ট্য:

১. এর ইল্লত বা কারণ নিয়ে মুজতাহিদদের মধ্যে তেমন মতভেদ থাকে না।

২. আসলের চেয়ে ফার'-এর মধ্যে ইল্লতটি সমানভাবে বা আরও প্রকটভাবে থাকে।

উদাহরণ:

কুরআনে পিতা-মাতাকে 'উফ' শব্দ (বিরক্তিসূচক শব্দ) বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে ইল্লত হলো 'কষ্ট দেওয়া'।

- **কিয়াস:** পিতা-মাতাকে 'প্রহার করা' (ফার')।
- **বিশ্লেষণ:** 'উফ' বলার চেয়ে 'প্রহার করা'-তে কষ্ট দেওয়ার বিষয়টি আরও বেশি স্পষ্ট ও জালি। তাই উফ বলা যদি হারাম হয়, তবে প্রহার করা আরও কঠিনভাবে হারাম হবে। এটিই কিয়াসুল জালি।

হানাফি মত:

সাধারণ অবস্থায় কিয়াসুল জালি গ্রহণ করা হয়। তবে যদি এর বিপরীতে শক্তিশালী কোনো দলিল বা 'কিয়াসুল খফি' (ইস্তিহসান) আসে, তবে হানাফি মাযহাবে ইস্তিহসানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

উসূলুল বাজদাবী : আল ইস্তিহসান

২৬. ইস্তিহসান (পছন্দ) কী? (ما هو الاستحسان؟)

উত্তর:

উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় 'ইস্তিহসান' একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিতর্কিত দলিল। হানাফি মাযহাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'ইস্তিহসান' (الِاسْتِحْسَانُ) শব্দটি 'হাসান' (حُسْنٌ) মূলধাতু থেকে 'বাব-ই-ইস্তিফ'আল'-এর মাসদার। এর অর্থ হলো:

১. কোনো কিছুকে উত্তম বা ভালো মনে করা (عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا)।

২. পছন্দ করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) ও হানাফি উসূলবিদগণের মতে:

"هُوَ الْعُدُولُ عَنْ مُوجَبِ قِيَاسٍ جَلِيٍّ إِلَى قِيَاسٍ خَفِيٍّ أَقْوَى مِنْهُ، أَوْ إِلَى نَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ ضَرُورَةٍ"

(অর্থ: শক্তিশালী কোনো দলিল (যেমন—সূক্ষ্ম কিয়াস, নস, ইজমা বা জরুরত)-এর কারণে প্রকাশ্য কিয়াসের (কিয়াসুল জালি) দাবি বর্জন করে ভিন্ন হুকুম গ্রহণ করাকে ইস্তিহসান বলে।)

ইমাম আল-কারখী (রহ.)-এর সংজ্ঞা:

"কোনো মাসআলায় পূর্বের নজিরের (কিয়াসের) হুকুম বর্জন করে ভিন্ন হুকুম দেওয়া, কারণ সেখানে এমন কোনো শক্তিশালী দলিল পাওয়া গেছে যা পূর্বের হুকুম পরিবর্তনের দাবি রাখে।"

সারকথা:

ইস্তিহসান মানে হলো—শক্তিশালী যুক্তির কারণে সাধারণ যুক্তি ত্যাগ করা। যেমন—কিয়াস বলে রোজা অবস্থায় ভুলবশত খেলে রোজা ভেঙ্গে যাবে

(নামাজের মতো)। কিন্তু ইস্তিহসান (হাদিস) বলে ভাঙ্গবে না। এখানে হাদিসের কারণে কিয়াস ছাড়া হয়েছে—এটাই ইস্তিহসান।

---

২৭. হানাফীদের নিকট ইস্তিহসান অনুযায়ী আমল করার বিধান কী? (ما حكم العمل بالاستحسان عند الحنفية؟)

উত্তর:

হানাফি মাযহাবে ইস্তিহসান কোনো ঐচ্ছিক বিষয় বা রুচির ব্যাপার নয়। বরং এটি শরীয়তের একটি অকাট্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এর ওপর আমল করার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

আমল করার বিধান (حكم العمل):

হানাফি ফকীহগণের মতে, যখন কোনো মাসআলায় 'কিয়াস' (সাধারণ যুক্তি) এবং 'ইস্তিহসান' (গভীর যুক্তি বা নস)-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং ইস্তিহসানের দলিল শক্তিশালী হয়, তখন ইস্তিহসানের ওপর আমল করা 'ওয়াজিব' (আবশ্যক) হয়ে যায় এবং কিয়াস বর্জন করতে হয়।

যুক্তি:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, ইস্তিহসান হলো সত্যের অধিক নিকটবর্তী। কারণ ইস্তিহসান মানুষের সুবিধা (মাসলাহাত) ও শরীয়তের উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"

(আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।)

যেহেতু ইস্তিহসান সহজীকরণের পথ দেখায়, তাই এর অনুসরণ ওয়াজিব।

ফলাফল:

ইস্তিহসানের ওপর আমল করলে বান্দার দায়িত্ব (জিম্মাদারি) আদায় হয়ে যায় এবং সে গোনাহমুক্ত থাকে। যেমন—শিকারি পাখির উচ্ছিষ্ট কিয়াসের দৃষ্টিতে

নাপাক, কিন্তু ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে মাকরূহ হয়ে পবিত্র। হানাফীরা ইস্তিহসান মেনে পানি ব্যবহার করেন।

শর্ত:

অবশ্যই ইস্তিহসানটি কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমার বিরোধী হতে পারবে না। এটি মুজতাহিদের খেয়ালখুশি নয়, বরং দলিলের পরিবর্তন মাত্র।

---

২৮. ইস্তিহসান বিল-কিয়াস ও ইস্তিহসান বিল-নস-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الاستحسان بالقياس والاستحسان بالنص؟)

উত্তর:

ইস্তিহসানের ভিত্তি বা উৎসের ভিন্নতার কারণে এটি কয়েক প্রকার হয়। তার মধ্যে 'ইস্তিহসান বিল-কিয়াস' (কিয়াস ভিত্তিক) এবং 'ইস্তিহসান বিল-নস' (কুরআন-হাদিস ভিত্তিক) অন্যতম। এদের পার্থক্য বোঝা জরুরি।

পার্থক্যসমূহ:

পার্থক্যের বিষয়	ইস্তিহসান বিল-কিয়াস (بالقياس)	ইস্তিহসান বিল-নস (بالنص)
সংজ্ঞা	যখন প্রকাশ্য কিয়াসের (জালি) বিপরীতে কোনো সূক্ষ্ম কিয়াস (খফি) পাওয়া যায় এবং সূক্ষ্মটি শক্তিশালী হয়।	যখন সাধারণ কিয়াসের বিপরীতে কুরআন বা সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট বাণী (নস) পাওয়া যায়।
ভিত্তি	এর ভিত্তি হলো মুজতাহিদের ইজতিহাদ বা বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা।	এর ভিত্তি হলো ওহী (কুরআন বা হাদিস)। এখানে মুজতাহিদের নিজস্ব গবেষণার সুযোগ কম।
শক্তি	এটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল, কারণ এটি মানুষের চিন্তাপ্রসূত।	এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও অকাট্য। এর বিপরীতে কোনো কিয়াস টেকে না।

উদাহরণ	শিকারি পাখির ঝুটা। কিয়াস বলে নাপাক (পশুর মতো), ইস্তিহসান (সূক্ষ্ম চিন্তা) বলে পাক (কারণ ঠোঁট শুকনো)।	রোজা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার। কিয়াস বলে রোজা ভাঙ্গবে, কিন্তু ইস্তিহসান (হাদিস) বলে ভাঙ্গবে না।

সারকথা:

ইস্তিহসান বিল-নস-এ মুজতাহিদ হাদিসের সামনে মাথা নত করে কিয়াস ছাড়েন। আর ইস্তিহসান বিল-কিয়াস-এ তিনি গভীর চিন্তার মাধ্যমে বাহ্যিক যুক্তি ছাড়েন। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হলো সঠিক সমাধানে পৌঁছানো।

---

২৯. ইস্তিহসান সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর (র) অভিমত কী? (ما هو رأي الشافعي في الاستحسان؟)

উত্তর:

ইস্তিহসান নিয়ে হানাফি ও শাফেয়ী মাযহাবের মধ্যে ঐতিহাসিক মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইস্তিহসানের কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং তিনি একে শরীয়তের দলিল হিসেবে স্বীকার করেননি।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমত:

তিনি ইস্তিহসানকে 'প্রবৃত্তির অনুসরণ' বা নিজের ইচ্ছামতো ফতোয়া দেওয়া বলে মনে করতেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো:

"مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ"

(যে ব্যক্তি ইস্তিহসান করল, সে যেন নিজেই শরীয়ত রচনা করল।)

সমালোচনার কারণ:

১. দলিল বিহীন ফতোয়া: তাঁর মতে, শরীয়তের উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এর বাইরে 'ভালো মনে করা' বা 'পছন্দ করা' কোনো দলিল হতে পারে না।

২. স্বেচ্ছাচারিতা: তিনি মনে করতেন, ইস্তিহসানের দরজা খুললে মানুষ নস ছেড়ে নিজের রুচির অনুসরণ শুরু করবে।

হানাফীদের জবাব:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ও হানাফি ফকীহগণ বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইস্তিহসানের মর্ম বুঝতে ভুল করেছেন। আমরা যে ইস্তিহসানের কথা বলি, তা 'প্রবৃত্তি' নয়। বরং তা হলো "তর্কুল কিয়াস লি-দালিলিন আকওয়া" (শক্তিশালী দলিলের কারণে দুর্বল কিয়াস বর্জন)। মূলত নাম ভিন্ন হলেও ইমাম শাফেয়ী নিজেও আমল বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে ইস্তিহসানের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যদিও তিনি একে ইস্তিহসান নাম দেননি।

---

৩০. ইস্তিহসানের বৈধতার দলীল কী? (ما هو دليل مشروعية الاستحسان؟)

উত্তর:

ইস্তিহসান কোনো মনগড়া বিষয় নয়। কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক দলিল দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত। হানাফি উসূলবিদগণ ইস্তিহসানের পক্ষে শক্তিশালী দলিল পেশ করেছেন।

বৈধতার দলিলসমূহ:

১. আল-কুরআন:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

"وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ" (সূরা যুমার: ৫৫)

(অর্থ: তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে, তার মধ্যে যা উত্তম, তার অনুসরণ কর।)

এখানে 'আহসান' (উত্তম) অনুসরণের নির্দেশ ইস্তিহসানের দিকে ইঙ্গিত করে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: "ফাত্তাবি'উ আহসানাহু" (তার উত্তমটির অনুসরণ কর)।

২. আল-হাদিস:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ" (মুসনাদে আহমাদ)

(অর্থ: মুসলমানগণ যা ভালো বা উত্তম মনে করে, আল্লাহর নিকটও তা ভালো বা উত্তম।)

এই হাদিসটি ইজমা এবং ইস্তিহসান উভয়ের দলিল। মুজতাহিদগণ যখন কোনো বিষয়কে উম্মতের জন্য কল্যাণকর মনে করেন, তখন তা শরীয়ত হিসেবে গণ্য হয়।

৩. যুক্তিবাদী দলিল (আকলী):

শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ (মাসলাহাত) ও সহজীকরণ (রফে হারাজ)। কিয়াস অনেক সময় বিধানকে কঠিন করে ফেলে। ইস্তিহসান সেই কাঠিন্য দূর করে সহজ সমাধান দেয়। সুতরাং, শরীয়তের মেজাজ বা রুচির দাবিই হলো ইস্তিহসানের বৈধতা।

উপসংহার:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, ইস্তিহসান মূলত কুরআন-সুন্নাহরই নির্যাস। এটি শরীয়তকে গতিশীল ও জনকল্যাণমুখী রাখে।

উসূলুল বাজদাবী : আল ইজতিহাদ

৩১. ইজতিহাদ কী? (ما هو الاجتهاد؟)

উত্তর:

ইসলামি শরীয়তের বিধানাবলী জানার অন্যতম মাধ্যম হলো 'ইজতিহাদ'। কুরআন ও সুন্নাহর সীমিত নস (Text) দিয়ে অসীম সমস্যার সমাধান করার একমাত্র উপায় এটি।

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):

'ইজতিহাদ' (الِاجْتِهَادُ) শব্দটি আরবি 'জাহদ' (جَهْدٌ) বা 'জুহদ' (جُهْدٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো:

১. কোনো কঠিন কাজ সম্পাদনে সর্বশক্তি ব্যয় করা (بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ)।

২. কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো।

আরবি ভাষায় বলা হয়, "اِجْتَهَدَ فِي حَمْلِ الصَّخْرَةِ" (সে পাথরটি বহন করতে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে)। সহজ কাজের ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার হয় না।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي):

উসূলবিদগণের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হয়:

"بَذْلُ الْفَقِيهِ وُسْعَهُ فِي تَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ"

(অর্থ: শরীয়তের কোনো বিধান সম্পর্কে প্রবল ধারণা (যন্ন) অর্জনের জন্য একজন ফকীহ বা মুজতাহিদের নিজের সর্বোচ্চ শক্তি ও মেধা ব্যয় করা।)

ইমাম আল-বাজদাবীর মত:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর মতে, ইজতিহাদ হলো এমন এক প্রচেষ্টা যা সত্য উদ্ঘাটনের জন্য করা হয়। তিনি বলেন, ইজতিহাদের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান নিশ্চিত (কাত'ঈ) নয়, বরং প্রবল ধারণামূলক (যন্নী), তবে আমল করার জন্য এটিই যথেষ্ট।

৩২. মুজতাহিদ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত আবশ্যক? (ما هي شروط المجتهد؟)

উত্তর:

ইজতিহাদ একটি গুরুদায়িত্ব। যে কেউ চাইলেই ইজতিহাদ করতে পারে না। মুজতাহিদ হওয়ার জন্য ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ও হানাফি ফকীহগণ কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন।

আবশ্যকীয় শর্তাবলি (الشروط اللازمة):

১. কিতাবুল্লাহর জ্ঞান: কুরআনের 'আয়াতুল আহকাম' (বিধান সম্বলিত আয়াত) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। নাসিখ-মানসুখ, আম-খাস এবং শানে নুযূল জানতে হবে।

২. সুন্নাহর জ্ঞান: আহকাম সম্পর্কিত হাদিসগুলো সনদের মান (সহীহ/যয়ীফ) সহ জানতে হবে। রাসূল (সা.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের ওপর দখল থাকতে হবে।

৩. ইজমার জ্ঞান: পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে একমত হয়েছেন এবং কোন বিষয়ে মতভেদ করেছেন, তা জানতে হবে। ইজমা বিরোধী ইজতিহাদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪. কিয়াসের দক্ষতা: সঠিক কিয়াস করার যোগ্যতা থাকতে হবে। ইল্লত বা কারণ বের করার পদ্ধতি (ইস্তিনবাত) জানতে হবে।

৫. আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য: আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সরফ ও অলংকারশাস্ত্রের ওপর পূর্ণ দখল থাকতে হবে, যাতে নসের সঠিক মর্মার্থ বোঝা যায়।

৬. ফিকহুন নাফস (অন্তর্দৃষ্টি):

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, শুধু কিতাবী বিদ্যা যথেষ্ট নয়, বরং মুজতাহিদের মধ্যে 'ফিকহুন নাফস' বা গভীর বোধশক্তি ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে।

৩৩. যন্নি (ধারণামূলক) মাসয়ালাগুলোর ক্ষেত্রে ইজতিহাদের বিধান কী? (ما حكم الاجتهاد في المسائل الظنية؟)

উত্তর:

শরীয়তের মাসআলা দুই ধরনের: কাত'ঈ (অকাট্য) এবং যন্নী (ধারণামূলক)। অকাট্য বিষয় (যেমন নামাজ ফরজ, সুদ হারাম)-এ ইজতিহাদ করা হারাম। কিন্তু যন্নী মাসআলায় ইজতিহাদ করা মুজতাহিদের জন্য বিশেষ বিধান রাখে।

ইজতিহাদের বিধান (حكم الاجتهاد):

যন্নী বা ধারণামূলক মাসআলায় ইজতিহাদ করা মুজতাহিদের জন্য 'ওয়াজিব' বা আবশ্যক। যখন কোনো নতুন সমস্যা দেখা দেয় এবং তার সরাসরি সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় পাওয়া যায় না, তখন মুজতাহিদকে অবশ্যই ইজতিহাদ করতে হবে।

সওয়াবের নিশ্চয়তা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"

(অর্থ: বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে দুটি সওয়াব পান, আর ভুল করলে একটি সওয়াব পান।)

হানাফি মত:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, যন্নী মাসআলায় মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন। তবে তাঁর ভুলটি মাফযোগ্য এবং তিনি চেষ্টার জন্য সওয়াব পাবেন। সাধারণ মানুষের (মুকাল্লিদ) জন্য মুজতাহিদের সেই যন্নী ফয়সালা মেনে নেওয়াই ওয়াজিব।

৩৪. ইজতিহাদ মুতলাক (নিরঙ্কুশ ইজতিহাদ) কী? (ما هو الاجتهاد المطلق؟)

উত্তর:

মুজতাহিদগণের স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হলো 'ইজতিহাদ মুতলাক' বা স্বাধীন ইজতিহাদ। একে 'ইজতিহাদ ফিস-শর''-ও বলা হয়।

সংজ্ঞা:

'ইজতিহাদ মুতলাক' হলো এমন ইজতিহাদ, যেখানে মুজতাহিদ শরীয়তের উৎস (কুরআন, সুন্নাহ) থেকে সরাসরি উসূল বা মূলনীতি তৈরি করেন এবং সেই উসূলের আলোকেই বিধান (ফুরু) বের করেন। তিনি অন্য কারো উসূল মানতে বাধ্য নন।

মুজতাহিদ মুতলাক-এর বৈশিষ্ট্য:

১. তাঁরা নিজেরাই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

২. তাঁরা উসূল এবং ফুরু উভয়টি প্রণয়ন করেন।

৩. তাঁরা কারো তাকলীদ বা অনুসরণ করেন না।

উদাহরণ:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হলেন 'মুজতাহিদ মুতলাক'। তাঁরা স্বাধীনভাবে গবেষণা করেছেন।

বর্তমান অবস্থা:

হানাফি ফকীহগণের মতে, এই স্তরের ইজতিহাদ বর্তমানে প্রায় অসম্ভব। এখন 'ইজতিহাদ ফিল মাযহাব' বা মাযহাবের ভেতরে থেকে গবেষণার যুগ চলছে।

---

৩৫. মুজতাহিদ এবং মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين المجتهد والمقلد؟)

উত্তর:

শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে উম্মত দুই ভাগে বিভক্ত: মুজতাহিদ এবং মুকাল্লিদ। এদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পার্থক্যসমূহ:

পার্থক্যের বিষয়	মুজতাহিদ (المجتهد)	মুকাল্লিদ (المقلد)
সংজ্ঞা	যিনি কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি বিধান বের করার যোগ্যতা রাখেন।	যিনি বিধান বের করতে পারেন না, তাই অন্যের রায় মেনে চলেন।
দায়িত্ব	তাঁর দায়িত্ব হলো গবেষণা (ইজতিহাদ) করা। তাকলীদ করা তাঁর জন্য হারাম।	তাঁর দায়িত্ব হলো মুজতাহিদের অনুসরণ (তাকলীদ) করা। ইজতিহাদ করা জায়েজ নেই।
উৎস	তিনি সরাসরি দলিল (কুরআন, সুন্নাহ) দেখেন।	তিনি মুজতাহিদের ফতোয়া বা রায়কে দলিল হিসেবে মানেন।
ভুল-ত্রুটি	ভুল করলে তিনি সওয়াব পান (যদি নিয়ত সৎ থাকে)।	ভুল মুজতাহিদের অনুসরণ করলে তাঁর কোনো দায় নেই।

হানাফি উসূল:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, "তাকলীদ হলো অজ্ঞদের জন্য, আর ইজতিহাদ হলো জ্ঞানীদের জন্য।" তবে মুকাল্লিদকেও অন্ধ অনুসারী না হয়ে দলিলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

৩৬. ইজতিহাদের প্রকারভেদগুলো কী কী? (ما هي أقسام الاجتهاد؟)

উত্তর:

মুজতাহিদের যোগ্যতা, কর্মপরিধি এবং স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে ইজতিহাদকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়। উসূলুল ফিকহের কিতাবগুলোতে ইজতিহাদের প্রধানত দুটি বা তিনটি মৌলিক প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়।

ইজতিহাদের প্রধান প্রকারভেদ (أقسام الاجتهاد):

১. ইজতিহাদ ফিস-শর' বা ইজতিহাদ মুতলাক (الاجتهاد في الشرع / المطلق):

এটি ইজতিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরের মুজতাহিদগণ সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে উসূল (মূলনীতি) এবং ফুরু (শাখা মাসআলা) উভয়টি উদ্ভাবন করেন। তাঁরা কারো তাকলীদ বা অনুসরণ করেন না।

- **উদাহরণ:** চার মাযহাবের ইমামগণ (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.)।

২. ইজতিহাদ ফিত-তাখরীজ বা ইজতিহাদ ফীল মাযহাব (الاجتهاد في التخريج في المذهب /):

এই স্তরের মুজতাহিদগণ কোনো একজন ইমামের (যেমন ইমাম আবু হানিফার) উসূল বা মূলনীতি মেনে নেন। তাঁরা নতুন উসূল তৈরি করেন না, বরং ইমামের উসূল প্রয়োগ করে নতুন নতুন মাসআলা (যা ইমাম বলে যাননি) বের করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম জুফার (রহ.)।

৩. ইজতিহাদ ফীল মাসাইল (الاجتهاد في المسائل):

যাঁরা মাযহাবের ইমামের উসূল ও ফুরু মেনে চলেন, কিন্তু কোনো কোনো মাসআলায় ইমামের রায়ের বিপরীতে দলিল ভিত্তিক ভিন্ন রায় দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন (তবে মাযহাবের গণ্ডির ভেতরে থেকে)। অথবা, যে মাসআলার সমাধান পূর্ববর্তীরা দেননি, তার সমাধান করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম তাহাবী, ইমাম কারখী, ইমাম সারাখসী (রহ.)।

আল-বাজদাবীর দৃষ্টিতে:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) মূলত ইজতিহাদকে 'শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা' হিসেবে দেখেন। তাঁর মতে, ইজতিহাদ মুতলাকের দরজা কার্যত বন্ধ হলেও, কিয়ামত পর্যন্ত ইজতিহাদ ফিত-তাখরীজ বা মাযহাবভিত্তিক ইজতিহাদের প্রয়োজন অব্যাহত থাকবে।

---

৩৭. মুজতাহিদের পক্ষে কি ভুল হওয়া সম্ভব? (هل يجوز للمجتهد أن يخطئ؟)

উত্তর:

ইজতিহাদী বিষয়ে মুজতাহিদ কি সবসময় সঠিক হন, নাকি তাঁর ভুলও হতে পারে—এ নিয়ে উসূলবিদগণের মধ্যে দুটি বিখ্যাত মতবাদ রয়েছে। হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মুজতাহিদের ভুল হওয়া সম্ভব।

১. আল-মুখাত্তিআহ (المخطئة) বা আহলুস সুন্নাহর মত:

হানাফি ফকীহগণ এবং জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, আল্লাহর নিকট প্রতিটি বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট ও সঠিক হুকুম রয়েছে। যে মুজতাহিদ সেই নির্দিষ্ট হুকুম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন, তিনি 'মুসীব' (সঠিক)। আর যিনি পৌঁছাতে ব্যর্থ হন, তিনি 'মুখতী' (ভুলকারী)।

- **সুতরাং:** মুজতাহিদের ভুল হওয়া সম্ভব।
- **তবে:** এই ভুলের জন্য তিনি গুনাহগার হবেন না। বরং সঠিক ইজতিহাদের জন্য দুই সওয়াব এবং ভুল ইজতিহাদের জন্য (চেষ্টার কারণে) এক সওয়াব পাবেন। দলিল হলো হাদিস: **"হাকিম ইজতিহাদ করে ভুল করলে এক সওয়াব।"**

২. আল-মুসাওয়িবা (المصوبة) বা মু'তাযিলাদের মত:

মু'তাযিলা সম্প্রদায় মনে করে, "কুল্লু মুজতাহিদিন মুসীব" (প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক)। তাদের মতে, আল্লাহর নিকট আগে থেকে নির্দিষ্ট কোনো হুকুম নেই। মুজতাহিদ যা সিদ্ধান্ত দেন, আল্লাহ সেটাকেই হুকুম হিসেবে মেনে নেন। তাই তাদের মতে মুজতাহিদ কখনো ভুল করেন না।

ইমাম আল-বাজদাবীর ফয়সালা:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) 'মুসাওয়িবা'দের মত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, সত্য একাধিক হতে পারে না। হক একটিই। সাহাবীগণ একে অপরের ইজতিহাদের সমালোচনা করেছেন এবং ভুল ধরেছেন। যদি সবাই সঠিক হতো, তবে তাঁরা ভুল ধরতেন না। তাই মুজতাহিদের ভুল হওয়া সম্ভব, তবে তা ক্ষমার যোগ্য।

---

৩৮. "ইলা নিহায়াতিল কিতাব" (কিতাবের শেষ পর্যন্ত) অর্থ কী? (ما هو معنى " إلى نهاية الكتاب " ؟)

উত্তর:

এই প্রশ্নটি সাধারণত মাদরাসার সিলেবাস বা পাঠ্যক্রমের সীমানা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'উসূলুল বাজদাবী' কিতাবের সর্বশেষ অধ্যায় হলো 'বাবুল ইজতিহাদ' (ইজতিহাদ অধ্যায়)। সিলেবাসে বা প্রশ্নে যখন বলা হয় "কিতাবুল ইজতিহাদ ইলা নিহায়াতিল কিতাব" (كِتَابُ الاجْتِهَادِ إِلَى نِهَايَةِ الْكِتَابِ), তখন এর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

অর্থ ও তাৎপর্য:

১. সিলেবাসের সমাপ্তি: এর অর্থ হলো, ইজতিহাদ অধ্যায় থেকে শুরু করে কিতাবের একদম শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যা কিছু আছে, সবই পাঠ্য বা আলোচ্য বিষয়।

২. অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি: এই অংশের মধ্যে কেবল ইজতিহাদের সংজ্ঞা বা শর্ত নয়, বরং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন:

- মুজতাহিদের প্রকারভেদ ও স্তর (তবকা)।
- মুজতাহিদ সঠিক বা ভুল করার বিতর্ক (তাসওয়িব ও তাখতিআ)।
- তাকলীদের বিধান।
- লেখকের সর্বশেষ ওসিয়ত বা উপদেশ (যদি থাকে)।
- কিতাবের সমাপ্তি বা 'খাতাম' বাক্য।

কিতাবের শেষ অংশের গুরুত্ব:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবের শেষে ইজতিহাদের আলোচনা এনেছেন এটি বোঝাতে যে, উসূলুল ফিকহের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ইজতিহাদ। একজন ছাত্র যখন কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস পড়া শেষ করে, তখন সে ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছায়। "ইলা নিহায়াতিল কিতাব" কথাটি মনে করিয়ে দেয় যে, ইলমের এই সফর এখানে শেষ হলেও আমল ও গবেষণার সফর এখান থেকেই শুরু।

সারকথা:

প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে এর উত্তর হলো—ইজতিহাদ অধ্যায় থেকে শুরু করে কিতাবের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সকল আলোচনা (তবকা, ইজতিহাদের হুকুম, ভুল-ত্রুটি ইত্যাদি) এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

---

৩৯. হানাফীদের নিকট মুজতাহিদগণের স্তর (তবকা) কী? (ما هي طبقة المجتهدين عند الحنفية؟)

উত্তর:

হানাফি মাযহাবে ফকীহ বা মুজতাহিদগণের যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদেরকে বিভিন্ন স্তরে বা 'তবকা'য় ভাগ করা হয়েছে। বিখ্যাত হানাফি আলেম আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (রহ.) এই স্তরবিন্যাসটি করেছেন, যা হানাফি উসূলে সর্বজনস্বীকৃত। তিনি মুজতাহিদদের ৭টি স্তরে (Tabaqat) ভাগ করেছেন।

মুজতাহিদগণের ৭টি স্তর:

১. মুজতাহিদ ফিস-শর' (مجتهد في الشرع):

যাঁরা শরীয়তের উসূল ও ফুরু নিজেই তৈরি করেছেন। যেমন: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)।

২. মুজতাহিদ ফীল মাযহাব (مجتهد في المذهب):

যাঁরা ইমামের উসূল মেনে নতুন মাসআলা বের করতে পারেন। যেমন: ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)।

৩. মুজতাহিদ ফীল মাসাইল (مجتهد في المسائل):

যাঁরা নতুন মাসআলা বের করেন না, কিন্তু যে বিষয়ে ইমামের ফতোয়া নেই, সেখানে ইজতিহাদ করেন। যেমন: ইমাম খাসসাফ, ইমাম তাহাবী (রহ.)।

৪. আসহাবুত তাখরীজ (أصحاب التخريج):

যাঁরা দলিল অস্পষ্ট থাকলে বা একাধিক রায় থাকলে ইমামের উসূলের ভিত্তিতে একটি রায় বের করেন (তাখরীজ করেন)। যেমন: ইমাম রাযী (রহ.)।

৫. আসহাবুত তারজীহ (أصحاب الترجيح):

যাঁরা ইমামদের একাধিক মতের মধ্যে কোনটি শক্তিশালী, তা প্রাধান্য (তারজীহ) দেন। যেমন: ইমাম কুদূরী, ইমাম মারগিনানী (রহ.)।

৬. আসহাবুত তাময়ীয (أصحاب التمييز):

যাঁরা শক্তিশালী (আকওয়া), দুর্বল (জয়িফ) এবং বর্জনীয় (মারদুদ) মতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। যেমন: 'কানযুদ দাকায়েক'-এর লেখক।

৭. মুকাল্লিদ বা সাধারণ ফকীহ (المقلد المحض):

যাঁরা কেবল কিতাব দেখে ফতোয়া দেন, নিজেরা কোনো বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেন না।

---

৪০. কখন ইজতিহাদ ওয়াজিব হয়? (متى يكون الاجتهاد واجبا؟)

উত্তর:

ইজতিহাদ সব সময় ওয়াজিব নয়, আবার সব সময় ঐচ্ছিকও নয়। পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে মুজতাহিদের ওপর ইজতিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

ইজতিহাদ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:

১. নতুন সমস্যার উদ্ভব (হাদিসা):

যখন সমাজে বা ব্যক্তির জীবনে এমন কোনো নতুন সমস্যা (Haditha) দেখা দেয়, যার সরাসরি সমাধান কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমার মধ্যে নেই। এবং ঘটনাটি

ঘটার পর সমাধানের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তখন মুজতাহিদের জন্য ইজতিহাদ করে সমাধান দেওয়া 'ওয়াজিব' (ফরযে আইন)।

২. ফতোয়া প্রার্থী আসলে:

যদি কোনো সাধারণ মানুষ মুজতাহিদের কাছে এসে এমন কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করে যা তার জন্য জরুরি (যেমন নামাজ বা হালাল-হারাম সংক্রান্ত), এবং ওই এলাকায় অন্য কোনো মুজতাহিদ না থাকে, তবে তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য গবেষণা বা ইজতিহাদ করা ওই মুজতাহিদের ওপর ওয়াজিব।

৩. বিচারকের জন্য:

বিচারক (কাযী) যখন কোনো মামলার রায় দেবেন এবং নস (Text) না পাবেন, তখন রায় দেওয়ার জন্য ইজতিহাদ করা তাঁর ওপর ওয়াজিব। তিনি ইজতিহাদ ছাড়া আন্দাজে রায় দিতে পারবেন না।

শর্ত:

ইজতিহাদ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো—মুজতাহিদের ইজতিহাদ করার পূর্ণ যোগ্যতা থাকতে হবে এবং হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকতে হবে। যদি তিনি অক্ষম হন, তবে অন্য বড় মুজতাহিদের ইজতিহাদ তালাশ করা ওয়াজিব।

উপসংহার:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, প্রয়োজনে ইজতিহাদ ত্যাগ করা বা অলসতা করা মুজতাহিদের জন্য গুনাহের কাজ। কারণ ইলম গোপন করা বা সমাধান না দেওয়া আমানতের খেয়ানত।